সত্যের সন্ধানেঃ ০২

কবরের তিন প্রশ্ন ও বর্তমান বাস্তবতা

মুহাম্মাদ আজিজুর রহমান খান

কবরের তিন প্রশ্ন
ও
বর্তমান বাস্তবতা

মোঃ আজিজুর রহমান খান

খান প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৭৪০১৯২৪১১।

কবরের তিন প্রশ্ন ও বর্তমান বাস্তবতা

মোঃ আজিজুর রহমান খান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৭
দ্বিতীয় প্রকাশ: জুন, ২০১২

খান প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার,
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

KOBORER TIN PROSHNO O BORTOMAN BASTOBOTA
MD. AZIZUR RAHMAN KHAN
PAB: KHAN PROKASHONI
PRICE: 30.00 TK. 1 DOLAR (US).

সকলকেই মরতে হবে

সকল প্রাণীকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

অর্থ: "সকল প্রাণীই মরণশীল, তারপর আমার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আনকাবুত ২৯, আয়াত ৫৭)

একইভাবে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

অর্থ: "প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর 'অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে–ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।" (সূরা আলে ইমরান ৩, আয়াত ১৮৫)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে মৃত্যু মানেই জীবনের শেষ নয়, মৃত্যুর পরে আবার আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। মরার পরে কেন আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যেতে হবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা সূরা মুলক -এ বলেছেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.

অর্থ: "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। যাতে করে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।"(সূরা মূলক ৬৭, আয়াত ২)

যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষরা সে দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছেন তাই আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পরে পরীক্ষা করবেন। যারা যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন তারাই হবেন কর্মে শ্রেষ্ঠ, আর যারা দায়িত্ব পালন করছেন না, তারা হবেন ক্ষতিগ্রস্থদের শামিল।

আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা বা তার হুকুম বাস্তবায়ন করা এবং জীবনের যাবতীয় কিছু তার আইন ও বিধান মাফিক পরিচালনা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব সম্পর্কেই মরণের পরে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।

মৃত্যু এক উপেক্ষিত বাস্তবতা :

আমাদের জীবনের বাস্তবতায় মৃত্যু চরমভাবে উপেক্ষিত। মৃত্যু একটি চরম বাস্তবতা, যা সকলের জীবনে অবশ্যম্ভাবী ঘটবে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কোন আলোচনা নেই। আমাদের আলোচনার টেবিলে মৃত্যু কখনো আলোচ্য বিষয় হয় না। আমরা সম্পদ বা অর্থ উপার্জন করার ফন্দি-ফিকির, পার্থিব জীবনের প্রতিষ্ঠা লাভ কিংবা খেলাধুলা, রাজনীতি, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা পার করে দেই। মৃত্যুর পর যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে তার প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। প্রত্যেকে মনে করে যে, মৃত্যু এত তারাতারি তাকে ধরবে না। আমাদের আশে পাশে প্রতিনিয়ত যে সকল মানুষ মারা যায়, তারাও মনে করতো মৃত্যু এত তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরবে না। ভাবখানা এমন এটাকে যত ভুলে থাকা যায় ততই যেন মঙ্গল।

কোন অসুস্থ লোক বা অসুস্থ সন্তান যখন বলে যে বাবা আমি বোধ হয় মরে যাব। বাবা মা তখন আঁৎকে উঠে বলেন- "এমন কথা বলতে নেই।" বাস্ত ব সত্যকে উপেক্ষা করার কি নিদারুণ ব্যার্থ প্রচেষ্টা। কোন মা বাবা বলে না যে- "হে প্রিয় সন্তান আমাদেরকে অবশ্যই একদিন মরতে হবে, তাই সময় থাকতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর, পরকালের পাথেয় গুলোকে সঞ্চয় কর। জীবনকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা কর"। তাহলে অবশ্যই আমাদের সন্তানদের মধ্যে আল্লাহর খাটি বান্দা হওয়ার জন্য মানসিকতা তৈরি হতো।

আমাদের সমাজে এরূপ ধারণা যে মৃত্যুর কথা চিন্তা করলে মানুষ নিঃস্ক্রীয় হয়ে পড়বে, মৃত্যুর ভয়ে কাজকর্ম বন্ধ করে দিবে। এটা আসলে ভীষণ ভুল ধারণা। বরং মৃত্যুর সঠিক চিন্তা সমাজকে সুন্দরভাবে গঠন করে এবং যিনি মৃত্যু চিন্তা করেন -আল্লাহ তা'আলা তার হায়াতে বরকত দেন। বর্তমানে

মানুষ যেভাবে ধান্ধার পিছনে ব্যস্ত হয়ে পরছে, তাতে মৃত্যু চিন্তা মানুষকে সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। পরকালের জন্য নিজকে তৈরি করতে গিয়ে আল্লাহর খাটি বান্দা হিসেবে প্রস্তুত করতে পারে।

আমাদের সমাজের একটি প্রচলিত ধারণা যে মানুষের গড় আয়ূ ৫০/৬০ বছর। আমরাও অন্তত ৬০/৭০ বছর তো বাঁচবই। এর মধ্যে জীবনের সকল কিছু গুছিয়ে নিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে বাড়ি, গাড়ি, ভাল বিয়ে, ব্যাংক ব্যালেন্স এগুলো গুছানোই হচ্ছে প্রধান কাজ। জীবনকে যতটা পারা যায় উপভোগ করে নিতে হবে। আমাদের মধ্যে মৃত্যু চিন্তা থাকলে আমরা কেবলমাত্র ভোগের প্রতিযোগিতায় মত্ত হতাম না। মৃত্যু বিবর্জিত বাস্তবতার জন্যই সমাজে সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, জালিয়াতি, জনগণের সম্পদ লুটপাট, কালোবাজারী, ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ কোন কিছুতেই মানুষ ভয় পায় না। হালাল হারাম কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। জান্নাতের জন্য কোন মোহ নেই। জাহান্নামের জন্য কোন ভয় নেই। এ যেন জাহিলিয়াত সমাজের আর এক নব্য কঠিন বাস্তবরূপ।

মানুষ কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে?

মানব জীবনের তিনটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে যে-

১. মানুষ কোথা থেকে এখানে এসেছে,
২. এখানে তার কি কাজ এবং
৩. এখান থেকে সে কোথায় যাবে।

মানুষের এ বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। এ বিষয়গুলোর উপলদ্ধির উপর নির্ভর করে যে পৃথিবীতে সে তার জীবন কিভাবে পরিচালনা করবে। আজকের সমাজের মানুষেরা, এখানে তার কি কাজ এবং এখান থেকে সে কোথায় যাবে এ বিষয়গুলো নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না।

সমাজের মানুষেরা দুনিয়াতে আজ যে ব্যবস্থা দ্বারা জীবন পরিচালনা করছেন, সে ব্যবস্থা 'মানুষ কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে' এ সকল বিষয় নিয়ে মোটেই ভাবতে শিখায় না। সমাজের মানুষেরা আজ বস্তুবাদী বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, ফলে ইহজাগতিক বস্তুবাদী বিষয়গুলো মানুষকে বেশী প্রলুব্ধ করে তোলে। মানুষকে ভাবতে শিখায়, সে এখানে

অনেক দিন বাঁচবে, এর মধ্যে বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা, চাকুরী, ভাল বিয়ে, বিদেশ ভ্রমণ, ব্যাংক ব্যালেন্স এবং জীবনকে উপভোগ করাই হচ্ছে প্রধান কাজ। এ ব্যবস্থা মানুষকে শিখায় - জীবন তো একটাই, এ জীবনে যত বেশী ভোগ করা যায়, যত বেশি ফূর্তি করা যায় এবং যত বেশী সম্পদ অর্জন করা যায়, সেই ততই সফল। এ সফলতার পিছনে ছুটতে গিয়ে মানুষ নিজের জন্য বেশি সম্পদ উপার্জন করতে চায় এবং এ সম্পদের ব্যবস্থা করতে গিয়ে নিজকে জড়িয়ে ফেলে লাগামহীন প্রতিযোগিতায়। ফলে সে ভুলে যায় জীবনের উদ্দেশ্যের কথা, ভুলে যায় দূর্লভ মানব-জীবনের আসল দায়িত্ববোধের কথা, ভুলে যায় এখান থেকে যেখানে যেতে হবে সেখানকার জবাবদিহীর কথা।

ইসলাম এমন এক জীবন-ব্যবস্থা, তা জীবনের এ সকল মৌলিক বিষয় নিয়ে মানুষকে ভাবতে শিখায় এবং এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সমাধান প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং এখানে সে কতদিন থাকবে তা বেঁধে দিয়েছেন। এখানে কি দায়িত্ব পালন করতে হবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখানকার সময় ফুরিয়ে গেলে তার গন্তব্য কোথায় তা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং সেখানে তার সকল কাজকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এ চরম সত্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

মৃত্যু মানে জীবনের পরিসমাপ্তি নয় :

আল্লাহ তা'আলা যে জীবন সৃষ্টি করেছেন তার কোন বিনাশ নেই। তিনি জীবনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। সকল রূহকে সৃষ্টি করে তিনি 'আলমে আরওয়াহ' বা রূহের জগতে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে রূহকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তার প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে। খলীফাগণ পৃথিবীতে কি কাজ করবেন তার জন্য দায়িত্ব এবং সময় বেঁধে দিয়েছেন। এ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে মানুষকে এখান থেকে আর একটি জীবনে ফিরিয়ে নেয়া হবে। পৃথিবী থেকে আর একটি জগতে ফিরিয়ে নেয়ার নাম হয়েছে মৃত্যু। মৃত্যু আসলে জীবনের শেষ নয়। জীবনের একটি পর্যায় থেকে আর একটি পর্যায়ে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র। এ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে যে জগতে ফিরিয়ে নেয়া হয় তার নাম হচ্ছে 'আলমে বরযখ'। এখানে সে কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন এখানকার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে কিনা তার জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এ বিচারের পরে এ সত্ত্বা অনন্তকাল জান্নাত বা জাহান্নামে অবস্থান করবে।

কবরের তিন প্রশ্ন :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মৃত্যুর পর কবরে মুনকার ও নকীর নামক দুজন ফেরেশ্‌তা মৃত ব্যক্তির কাছে তিনটি প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলো হল–

১. মার রাব্বুকা,
২. মা দীনুকা এবং
৩. ওয়া মান হাযার রাজুল।

এ তিনটি প্রশ্নের মধ্যে মানব জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডকে বুঝানো হয়েছে। মানুষরা তাদের জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে কাকে ইলাহ মেনেছে, কোন ব্যবস্থার দ্বারা জীবন পরিচালনা করেছে, সারা জীবনে কার আদর্শ বাস্ত বায়ন করেছে -এ সকল কিছুকে বুঝানো হয়েছে।

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন, যারা মনে করেন যে, কেবল মাত্র নামায রোজা পালন করলেই এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আল্লাহ তা'আলা মনে করিয়ে দেবেন। এ হচ্ছে এক আত্মঘাতী বুঝ। এবারে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর এবং আমাদের বর্তমান বাস্তবতার দিকে একটু নজর দেয়া যাক। কবরে প্রথম প্রশ্ন হবে-

১. মার রাব্বুকা- তোমার রব কে?

'মার রাব্বুকা' অর্থ তোমার রব কে?

প্রতিটি সৃষ্টিরই কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন অত:পর যখন যার যা প্রয়োজন, তখন তিনি তার জন্য তা ব্যবস্থা করে দেন। যিনি পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও আইন বিধানদাতা। সৃষ্টির সকল কিছুর উপরে যার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিরাজমান। তিনিই হচ্ছেন আমাদের 'রব'। তার প্রতি ঈমান এনে আন্তরিকভাবে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে মৌখিকভাবে এ কথার ঘোষণা করা এবং আমলের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে রবের প্রতি ঈমান আনার মর্মকথা।

রবের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) আমাদেরকে পৃথিবীতে নিয়ম-তান্ত্রিকভাবে পাঠানোর পূর্বেই আরাফাতের ময়দানের 'না'মান' নামক জায়গায় একত্রিত করে রবের প্রতি ঈমানের বিষয়ে আমাদের সকলের থেকে স্বীকৃতি আদায় করলেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

অর্থ: "আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমার রব আদম আ. এর পিঠের থেকে তার সন্তানদের (রুহ গুলোকে বের করলেন। আবার সেই সন্তানদের পিঠের থেকে তাদের সন্তানদের এইভাবে সকলের) রুহ গুলোকে বের করলেন। এরপর তাদের উপরে তাদের নিজেদেরকে সাক্ষি বানালেন। এরপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি তোমাদের রব নই কী? তখন সকলে সমস্বরে ঘোষণা করলো, অবশ্যই অবশ্যই আপনি আমাদের রব এবং আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।" (সূরা আরাফ, আয়াত ১৭২)

দুনিয়াতে আসার পরেও যাতে কেউ ভূলে না যায় সেজন্য প্রতিটি সালাতের প্রতিটি ওয়াক্তে, প্রতি রাকাআতে দাঁড়িয়ে বলা হয় الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "সকল প্রশংসা কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য যিনি গোটা জগত সমূহের রব"। এরপরে রুকুতে গিয়ে বলতে হয় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) 'মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি' এরপরে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হয় رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকাল হামদ্) 'হে রব! সকল প্রশংসা তোমার জন্য' আবার সেজদায় গিয়ে বলতে হয় سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى। (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) অর্থৎ তার মানে দাঁড়ানো অবস্থায় রব, রুকুতে গিয়ে রব, রুকু থেকে সোজা হয়ে রব, সেজদায় গিয়ে রব। তারপর সবশেষে কবরে গিয়েও প্রশ্ন কে তোমার রব, রবের পরীক্ষা। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, রবের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব কত বেশী। তাই রবের পরিচয় সম্পর্কে জানা প্রতিটি ঈমানদারের প্রথম দায়িত্ব।

আমরা রবের পরিচয় জানতে পারি পবিত্র কুরআনের সুরায়ে ত্বা'হা-র ৪৩ নাম্বার আয়াত থেকে ৫০ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত গবেষণা করার মাধ্যমে। এ আয়াতগুলোতে মুসা (আ:) তার সময়ের মিথ্যা রব দাবীদার ফেরআউনকে প্রকৃত রবের পরিচয় তুলে ধরে যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন তার আলোচনা রয়েছে।

আল্লাহ (সুব:) মুসা আ: ও তার ভাই হারুন আ: কে হুকুম দিয়ে বললেন:

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.

অর্থ: "তোমরা যাও ফিরআউনের কাছে, কেননা সে (নিজে রব দাবী করে) সীমালংঘন করেছে।" (সূরা ত্বা'হা ২০, আয়াত ৪৩।)

কেননা ফিরআউন নিজেকে রব বলে দাবী করেছিলো। ফেরাউন একজন রাস্ট্র প্রধান। সে নিজেও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। কিন্তু সে নিজের রাস্ট্রে সার্বভৌমত্ব দাবী করার ফলে রব সেজে বসল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ফেরাউনের সার্বভৌমত্বের কথা নিম্নোক্তভাবে বলেছেন,

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ.

অর্থ: "ফেরাউন তার জাতীর উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিল। সে বলল, হে লোকেরা, মিসরের স্বার্বভৌমত্ব কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছ না যে, এ নদীগুলো আমার (রাজত্বের) অধীনেই বয়ে চলেছে।" (সুরা যুখরুফ ৪৩, আয়াত ৫১)।

উপরোক্ত আয়াতের বাস্তব চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ফেরাউন সার্বভৌমত্বের দাবী করেছে। যেহেতু আসমান জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তা আমাদের কাছে বিভিন্ন আয়াতে একাধিক বার ঘোষণা করেছেন। এ সার্বভৌমত্ব যখন কোন রাজা, বাদশা, প্রধানমন্ত্রী, রাস্ট্র প্রধান, কোন গোষ্ঠী বা কোন ব্যবস্থা দাবী করলে সে রবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়।

ফেরাউন সার্বভৌমত্ব দাবী করেছে বলেই রবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। অপর এক আয়াতে এ কথা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে একথা শুনিয়েছেন,

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى.

অর্থ: "ফেরাউন ঘোষণা করল, আমিই হচ্ছি তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব।" (সুরা নাজিয়াত ৭৯, আয়াত ২৪)

এ আয়াতে দেখা যায় ফেরাউন সরাসরি নিজেকে রব দাবী করেছে। এ রব দাবী করার অর্থ হচ্ছে, সে তার রাজ্যের সার্বভৌমত্বের অধিকার রাখে। এ জন্যই সে নিজেকে রব হিসেবে দাবী করে ছিল।

কুরআনে এ সকল আয়াত ফেরাউনের কাহিনী আমাদের নিকট পেশ করার কারণ আমরা যেন এমন কোন রাজা বাদশাকে বা কোন ব্যবস্থাকে না মানি যারা সার্বভৌমত্বের দাবী করে বসে। কারণ আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়োর মানে হচ্ছে তাকে রব বলে স্বীকার করে নেয়া হবে।

এবারে যে ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের শাসন করা হচ্ছে সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। গণতন্ত্র বলতে জনগণের শাসন ব্যবস্থা, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা অর্থে বুঝানে হয়। জনগণ নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা তৈরি করে, ক্ষমতার অনুশীলন করে, আইন রচনা করে, তারা শাসক নির্বাচন করে, নিজেদের কর্তৃক নির্বাচিত শাসকদের মাধ্যমে তাদের প্রণীত ব্যবস্থা ও আইন বাস্তবায়ন করে। জনগণই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা ধারণ করে এবং জনগণই তাদের সার্বভৌমত্ব চর্চা করতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ হয়ে দাড়ায় সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস।

ফেরাউন সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করার ফলে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে রব হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার দাবী করার ফলে সে নিজেই নিজের রব হয়ে বসে। অর্থাৎ জনগণই এ ব্যবস্থার প্রভু। ফেরাউনকে মানলে যদি শিরক হয় তাহলে এ গণতন্ত্র মানলেও শিরক হবে। তাহলে যারা এ ব্যবস্থা কায়েম করবে এবং মেনে নিবে তারা কবরের মার রাব্বুকা প্রশ্নের জবাবে গণতন্ত্র ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করবে।
তাহলে দেখা যায় যে কবরের সঠিক জবাব দিতে হলে মুসলমানদের জন্য এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা দরকার যা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহর হুকুম কেবলমাত্র ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অন্য কোন নিজেদের ইচ্ছেমতো পরিচালনা করবে না। রসুলুল্লাহ সা. মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর বিধিবিধান কে পুরাপুরি বাস্তবায়ন করে মানুষকে শিরক থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই কবরের সঠিক জবাবের জন্য ইসলামী রাস্ত্র ব্যবস্থা বা খিলাফত রাস্ত্র ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হযরত মূসা আ. ও ফিরআউনের ঘটনায় রবের পরিচয় সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে,
মূসা (আ:) ও হারুন (আ:) যখন ফিরআউনের কাছে গিয়ে তাকে রবের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন তখন ফিরআউন, মূসা (আ:) ও হারুন (আ:) কে জিজ্ঞেস করলো,

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى.

অর্থ: "তোমাদের রব কে? (কি তার পরিচয়?)।" (সূরা ত্বা'হা ২০, আয়াত ৪৯।)

ফিরআউন এই প্রশ্ন করার কারণ এই যে, রবের একটা অর্থ হলো: প্রতিপালক, লালন-পালনকারী। সেটা ফিরআউনও বুঝতো। আর মূসা আ. যেহেতু ফিরআউনের ঘরেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন তাই ফিরআউন জানতে চাইলো যে, সে ছাড়া আবার মুসার রব কে? অর্থাৎ ফিরআউন এটাই বলতে চাচ্ছিলো যে, তোমার রব তো আমিই। তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিচ্ছো?

মুসা (আ:) তখন যেই উত্তর দিয়েছিলেন তা হচ্ছে:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.

অর্থ: "মূসা আ. বললেন, আমার রব হচ্ছেন তিনি, যিনি সকল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন এরপর সৃষ্টি থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল কিছুর ব্যবস্থা করেন।" (সূরা ত্বা'হা ২০, আয়াত ৫০)

অর্থাৎ যিনি সকল সৃষ্টির জীবন-যাপনের পদ্ধতি শিক্ষাদান করেন, জীবনের ধাপে ধাপে যা কিছু প্রয়োজন সেগুলো পূরণ করেন তিনিই হচ্ছেন 'রব'।

রবের পরিচয় সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে,

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.

অর্থ: "(তিনিই আমার রব) যিনি আমাকে খাবার ও পানীয় সরবরাহ করেন, যখন আমি অসুস্থ্য হই তখন তিনি আমাকে সুস্থ্য করেন।" (সূরা শুআরা ২৬, আয়াত ৭৯-৮০।)

এভাবে যদি প্রতিটি মানুষ একটু চিন্তা করে, তাহলেই সে তার রবের পরিচয় জানতে পারবে। এমনকি যদি সে নিজের মধ্যেই চিন্তা-গবেষণা করে তাহলেও রবের পরিচয় পেয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

অর্থ: "আর তোমাদের মধ্যেও (ভালোভাবে লক্ষ্য করো) আমার পরিচয় পেয়ে যাবে। এরপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?" (সূরা যারিয়াত ৫১, আয়াত ২১)

উপরোক্ত আলোচনাসমূহ থেকে আমরা রবের একটি পরিচয় পেয়েছি। রবের এই পরিচয়টি খুবই সহজ ও সাবলীল হওয়ার কারণে সাধারণত সকলেই মহান আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা হিসেবে রব বলে অবলীলায় স্বীকার করে নেয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় এর পরক্ষণেই। কারণ যিনি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে রব, পালনকর্তা, রিযিকদাতা হিসেবে রব, সামাজিক সকল বিষয়ালীর ক্ষেত্রেও একমাত্র তাঁরই রব হওয়ার কথা। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল আইন-কানুন, সংবিধান, স্বার্বভৌমত্বও তাঁরই হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে এসেই গন্ডগোল লেগে যায়। এ বিষয়টিই আমাদের আজকের সমাজের সকল মুসলিদের কাছে পরিস্কার নয়। যার কারণে আজ আমরা নামাজ, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যে মহান আল্লাহকে একক রব বলে স্বীকার করলেও আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে এসে আরো অনেক রবের ইবাদতে ঢুকে পড়ি। একজন একনিষ্ঠ মুসলিমের জন্য যার কোনো অনুমতি নেই।

পবিত্র কুরআনে রব বলতে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালনকর্তা, আইনদাতা, হুকুমদাতা, রিজিকদাতা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। মুসলমানদের সৃষ্টিকর্তা, ইলাহ, আইনপ্রণেতা, পালনকর্তা ও হুকুমদাতা এগুলোর রব হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এসকল গুণাবলীর মধ্য থেকে যে কোন একটির জন্যও যদি অন্য কোন স্বত্তার উপর নির্ভর করা হয়, তাহলে সে গুণাবলীর জন্য ওই স্বত্তাকে রব হিসেবে মান্য করা বুঝায়। এজন্যই মানব জীবনে এই রকম একাধিক রবের আবির্ভাবের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুবঃ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াতে অসংখ্যবার হুঁশিয়ারী উচ্চারণর করেছেন। যেমন সূরায়ে ইউসূফে হযরত ইউসূফ আ. এর ঘটনা শোনানোর মধ্যে ইরশাদ হয়েছে,

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

অর্থঃ “হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক রব, উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?” (সুরা ইউসুফ ১২, আয়াত ৩৯)
হযরত ঈসা আ. এর কণ্ঠে জানানো হয়েছে,

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.

অর্থ: "তিনি (ঈসা আঃ) আরও বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার রব ও তোমাদের রব। অতএব, তোমরা তার এবাদত কর। এটা সরল পথ।" (সুরা মারইয়াম ১৯, আয়াত ৩৬)

মানুষ কিভাবে রবের আসন দখল করে নিজেরাই রব ও ইলাহ্ হয়ে যায় সে সম্পর্কে পরিস্কার বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ও তার ব্যখ্যায় প্রিয়নবী সা. এর হাদীসে। ইরশাদ হয়েছে:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থ: "তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের (শাসক ও পীর বুজুর্গদের) রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" (সুরা তাওবা ৯, আয়াত ৩১)

এই আয়াতের তাফসীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ কিভাবে মানুষের রব বনে যায়।

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– وَفِى عُنُقِى صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ. قَالَ : « أَجَلْ وَلَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيُحَرِّمُونَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ »

অর্থ: "হযরত আদী ইবনে হাতিম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি খৃষ্টান ছিলেন, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলাম। আমার গলায় স্বর্ণের একটি ক্রুশ ছিল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এই আয়াত পড়তে শুনলাম, "তারা তাদের ধর্মীয় পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে।" (তাওবা ৯, আয়াত ৩১)

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তাদের ইবাদত করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হ্যা! তোমরা জেনে বুঝে তা করা না। তবে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করে, অত:পর তোমরা তা হালালরূপে মেনে নাও এবং আল্লাহ্ যা হালাল

করেছেন, তারা তা হারাম করে, অত:পর তোমরা তা হারাম মেনে নাও। এটাই হচ্ছে তাদের ইবাদত করা।" (সুনানে বায়হাকী ২০৮৪৭।)

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম রাযী (রহ) তার তাফসীরে বলেন:

اَلْأَكْثَرُوْنَ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ قَالُوْا: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْأَرْبَابِ أَنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ آلِهَةُ الْعَالَمِ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ أَطَاعُوْهُمْ فِىْ أَوَامِرِهِمْ وَنَوَاهِيْهِمْ)

অর্থ: "অধিকাংশ মুফাসসীরদের বক্তব্য হলোঃ তারা তাদের ধর্মীয় নেতা এবং পীর-বুযুর্গদেরকে গোটা সৃষ্টির রব বলে বিশ্বাস করতো না। বরং তারা তাদেরকে নিজ এলাকার (স্বার্বভৌমত্বের) সর্বময় ক্ষমতার মালিক এবং আদেশ-নিষেধের মালিক জ্ঞান করতো।" (তাফসীরে রাযী ৮ম খন্ড ৩য় পৃষ্ঠা)

মোটকথা যারা আল্লাহর দেয়া বিধান পরিবর্তন করে নিজেরা বিধান রচনা করবে তারা মূলত: নিজেদেরকে রবের আসনে বসিয়েছে এবং আল্লাহর সমকক্ষতার দাবী করেছে। আর আল্লাহর সমকক্ষতার দাবী করা স্পষ্টই শিরকী কাজ।

পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে তাদেরকে আল্লাহর সুব. শরীক বা অংশীদার বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অর্থ: "তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান রচনা করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে (কেয়ামতের সময় নির্ধারিত না থাকলে) তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" (সুরা শুরা ৪২, আয়াত ২১)

অংশীদারিত্বের জন্য সকল অংশীদারের অংশ সমান হওয়া জরুরী নয়। বরং যার ৯৯%শেয়ার আছে সে যেরকম অংশীদার যার ১% শেয়ার আছে

সেও অংশীদার। ঠিক আল্লাহর সাথে অংশীদার হওয়ার জন্য আল্লাহর সকল আইনকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করার প্রয়োজন নেই। বরং আল্লাহর সুব. কোন একটি আইনকেও যদি বর্তমান যুগের জন্য অযোগ্য মনে করে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করা হয় তাহলেও এই কাজটি যে বা যারা করবে সে বা তারা আল্লাহর শরীক বা অংশীদার দাবীকারী বলে গণ্য হবে। একজন মুসলিমকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এ জাতীয় বাতিল আল্লাহ এবং বাতিল রবদেরকে বর্জন করতে বলা হয়েছে।

যুগে যুগে দুই শ্রেণীর মানুষেরা আল্লাহর নাজিলকৃত আইন-বিধানকে পরিবর্তণ করেছে। এক: শাসকগোষ্ঠী। দুই: পীর-মাশায়েখ নামধারী এক শ্রেণীর ধর্মীয় আলেম। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন:

وَهَلْ بَدَّلَ الدِّيْنَ اِلَّا الْمُلُوْكُ * وَاَحْبَارُ سُوْءِ وَرُهْبَانُهَا

অর্থ: "যুগে যুগে ইসলামের ক্ষতি এক শ্রেণীর শাসক গোষ্ঠী এবং পীর-মাশায়েখ নামধারী এক শ্রেণীর ধর্মীয় আলেম সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কেউ করেছে কি?" (কিতাবুল জিহাদ আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ১ম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

কলেমা শাহাদাতে'র' ঘোষণা হচ্ছে "নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া"। কিন্তু বাস্তব জীবনের বিভিন্ন কাজে-কর্মে মানুষেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ'র অনুসরণ করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اَ رَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الــهه هَوــهُ.

অথ: "আপনি কি তাদের দেখেছেন যে নিজের প্রবৃত্তিকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে" (সুরা ফুরকান ২৫, আয়াত: ৪৩)

প্রবৃত্তিকে রব বানানোর অর্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। অনেকে প্রবৃত্তির বা নফ্সের খেয়াল খুশীর দাসত্ব করেন। অর্থাৎ আল্লাহর কোন নির্দেশের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাকে প্রধান্য দিয়ে থাকেন। হযরত আবু উসামা (রা.) বর্ণিত হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"এ আসমানের নিচে আল্লাহ ছাড়া আর যত মাবুদের পুজা করা হয় তার মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট মাবুদ হচ্ছে প্রবৃত্তি যার হুকুম মেনে চলা হয়।"

যারা প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, তাদের রব হিসেবে এ প্রবৃত্তিকে বুঝাবে এবং মার রাব্বুকা প্রশ্নের জবাবে তারা যেসব প্রভুদের নাম উচ্চারণ করবে, তার মধ্যে নিজের নফ্সের নাম ও উচ্চারণ করবে।

এবারে দেখা যাক আইনদাতা রব হিসেবে কাকে মান্য করা হয়। আইন দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ.

অর্থ: "বস্তুত সার্বভৌমত্ব, শাসন কর্তৃত্ব এবং বিধান দেয়ার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়।" (সূরা সূরা ইউসুফ ১২, আয়াত ৪০)

মানুষেরা কেবল আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আইন বাস্তবায়ন করবে। মানুষের সীমাবদ্ধতার জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয় নি। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য সার্বজনীন এবং সর্বকালের উপযোগী আইন-কানুন পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং তা পালন ও বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক করেছেন।

কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষেরা তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে জাতীয় সংসদ নামক ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে। এখানে যারা অংশ গ্রহণ করে তারা কুরআন সুন্নাহকে পাশ কাটিয়ে সমাজের জন্য বা রাষ্ট্রের জন্য নিজেরা আইন রচনার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। তারা নিজকে আল্লাহ তা'আলার একটি ক্ষমতার সাথে অংশীদার করল। এটি একটি স্পষ্ট শিরক। কারণ আইন দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।

বিষয়টির আর একটু স্পষ্ট উদাহরণ দেয়া যাক। রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে মানুষের আইনদাতা ইলাহ হতে পারে তা আজকের মুসলমানরা প্রায় ভুলেই গেছেন। এ বিষয়টি আজকে উপলব্ধি করা বেশী জরুরী। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআন থেকে ফেরাউনের উদাহরণ উদ্বৃত করা যায়।

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اله غَيْرِىْ.

অর্থ: "ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে আমার জানা নাই।" (সুরা কাসাস:৩৮০)।

উপরোক্ত আয়াতে ফেরাউন নিজেকে ইলাহ হিসেবে দাবী করেছে। এ কথার অর্থ এ নয় যে সে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা বা আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করার দাবী করে ছিল। কিংবা এ কথার অর্থ এটাও নয় যে সে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করতো না। ফেরাউন তার আইন দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতো। এ হতে এটা প্রমাণীত হয়, আল্লাহর কিতাবের হালাল-হারামের মাপকাঠি বাদ দিয়ে যারা আইন প্রণয়ন করে তারা অইনদাতা ইলাহ হিসেবে পর্যবশিত হয়। ফেরাউন এ কাজটিই করেছিল। তৎকালীন সময়ের ফেরাউনরাও আল্লাহকে স্বীকার করতো কিন্তু নিজেরা আইন প্রণয়ন করার ভুমিকা পালন করতো। আমরা যেন ফেরাউনদের মতো কোন শাসকদের মেনে না নেই, সেজন্যই আলাহ তায়ালা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে উপরোক্ত আয়াতের দ্বারা সতর্ক করেছেন। ফেরাউনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা বার বার ফেরউনের কথা উল্লেখ কেরছেন। পবিত্র কুরআনে ৭৮ বার ফেরাউন শব্দ টি এসেছে। আমরা যেন ফেরাউনদের মতো কোন শাসকদের মেনে নিয়ে শিরকের মধ্যে লিপ্ত না হই। মুসলমান কর্তৃক এ অসৈলামিক শাসকদের মেনে নিলে তা নব্য ফেরাউনকে মান্য করা বুঝাবে। সে জন্যই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আমাদের সামনে ফেরাউনের কাহিনী শুনিয়েছেন।

ফেরাউনরূপী শাসকদের হুকুম কোন ভাবেই মেনে নেয়া যাবে না। এ বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা অপর একটি আয়াতে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱتَّبَعُوٓا۟ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد

অর্থ: “আমি আর ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে মূসা (আঃ) কে প্রেরণ করি আমার নিদর্শনাদী ও সুস্পষ্ট সনদসহ, তবুও তারা ফেরাউনের বিধিবিধানে চলতে থাকে, অথচ ফেরাউনের হুকুম সত্যপন্থি ছিল না। (সূরা হুদ ১১, আয়াত ৯৬-৯৭)

এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তিনি মুসা (আঃ) ফেরাউন ও তার পরিষদ বর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলিন। তার পরেও লোকেরা মুসা (আঃ)-এর কথা না শুনে ফেরাউনের হুকুম বা তার বিধিবিধান অনুসারে চলতে ছিল। কিন্তু ফেরাউন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সে সত্যকে বাদ দিয়ে নিজের বিধি বিধান দ্বারাই লোকদের পরিচালনা করছেল। তাই

ফেরউনের বিধি বিধান কোন ভাবেই মেনে নেয়া যাবে না। সেটাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে "তবুও তারা ফেরাউনের হুকুম অনুসারে চলতে থাকে"। অথাৎ যারা সত্যকে বাদ দিয়ে নিজেদের বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালনা করে তাদের হুকুম মানা যাবে না তাই এ আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

আজকে সমাজে বা রাষ্ট্রে যারা কুরআন সুন্নাহকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজেদের ইচ্ছেমতো আইন প্রণয়ন করে এবং তা মানুষদের মানতে বাধ্য করে তারাও মূলতঃ ফেরাউনের মতো ভূমিকা পালন করে। আজকের শাসক শ্রেণীও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করে এবং নিজেরা আইন প্রণয়নকরীর ভুমিকা পালন করে। ফেরাউনকে মান্য করলে আল্লাহর সাথে শির্‌ক করা হতো। তৎকালীন ফেরাউন এবং আজকের আইন প্রনয়নকারী শাসকশ্রেণীর মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে তেমন কোন পার্থক্য নেই। আজকে যারা আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে সংসদে বসে নিজেদের তৈরি করা আইন মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়, তারা প্রকারান্তে ফেরাউনের ভুমিকা পালন করছে। এদেরকে সমর্থন করা বা মেনে নেয়ার মানে হচ্ছে ফেরাউনকে মান্য করার নামান্তর এবং সরাসরি শির্‌কে অংশ গ্রহণ করা। মুসলমান কর্তৃক এ অইসেলামিক শাসকদের মেনে নিলে তা নব্য ফেরাউনকে মান্য করা বুঝাবে।

এ নব্য ফেরাউনদেরকে মান্য করলে তা স্পষ্ট শিরক হবে।

◎ ফিরাউন একজন বাদশা যা আজকের সরকার প্রধান বা রাস্ট্র প্রধান। তৎকালীন সময়ের ফেরাউনরাও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করেতো আজকের গণতন্ত্রিক নামধারী শাসকশ্রেণী আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করে।

◎ ফেরাউন আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে নিজের হুকুম দ্বারা জনগণকে পরিচালনা করতো। আজকের গণতান্ত্রিক শাসকশ্রেণীও আল্লাহর হুকুমকে পাশ কাটিয়ে নিজেরা আইন প্রনয়ণ করে এবং তা দ্বারা জনগণকে পরিচালনা করে।

◎ ফেরাউন আইন প্রনয়ণ করার ফলে যদি আল্লাহর সিফাতের সাথে শিরক হয়ে থাকে তাহলে আজকের গণতান্ত্রিক শাসক শ্রেণীর আইন প্রনয়ণ করার ফলেও আল্লাহর সিফাতের সাথে শিরক হবে।

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থার পক্ষে কাজ করা যাবে না। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল কিছুই বাতিল বা অজ্ঞতা বা জাহিল। কোন মুসলমান

কোন জাহিল ব্যবস্থার দিকে কোন মানুষকে আহ্বান করতে কিংবা গ্রহণ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-
"আর যে লোক জাহেলী মতবাদ আর আদর্শের দিকে লোকদের আহ্বান করলো, সে জাহান্নামী। যদিও সে রোজা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজকে মুসলমান হিসেবে দাবী করে।"- তিরমিযী, মুসনাতেদ আহমদ

এভাবে আজকের মুসলমানরা তাদের কাজে-কর্মে কখনো ইলাহ হিসেবে নিজের নফস্ কিংবা অন্য কোন শক্তিকে (আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যাদেরকে মানা হয়) মান্য করছেন। আইন-দাতা ইলাহ হিসেবে জাতীয় সংসদ নামক ব্যবস্থাকে মান্য করছেন। রিজিকদাতা বা প্রতিপালনকর্তা রব হিসেবে বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা (যারা বিভিন্ন শর্তারোপ করে কৌশলে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করতে বাধ্য করে) এরকম কোন শক্তিকে মান্য করছেন। তাহলে কবরে মার রাব্বুকা প্রশ্নের জবাবে এ শ্রেণীর মানুষেরা রব হিসেবে নিজর নফ্স, জাতীয় সংসদ নামক আইন রচনাকারী ব্যবস্থা কিংবা বিভিন্ন অনৈসলামিক সাহায্যকারী শক্তির কথা উল্লেখ করবেন। তাহলে কবরে আসল রবকে আর নিজের সাহায্যকারী হিসেবে পাওয়া যাবে না। তাহলে কি কবরের কঠিন আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে?

হতে পারে আমরা না বুঝে এ প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়িয়ে আছি কিংবা হতে পারে আমাদের মধ্যে সত্যিকার ইসলামী জ্ঞানের অভাবের জন্য এভাবে জীবন চালাচ্ছি। তাহলে আর কতকাল আমরা এ ভ্রান্তির আবর্তে নিমজ্জিত থাকব। আমরা কতকাল মুখে আল্লাহ তা'আলাকে রব বলব আর কাজে-কর্মে অন্য রবকে মান্য করে আল্লাহর সাথে শিরক করতে থাকব?
উপরের আলোচনা থেকে আমরা পরিস্কারভাবে বুঝেতে পেরেছি যে, একজনের মুসলিমের জন্য তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল বিষয়ে রব হিসেবে একমাত্র মহান আল্লাহকেই গ্রহণ করতে হবে। আর যারা তাদের পূর্ণ জীবনে রব হিসেবে একমাত্র মহান আল্লাহর উপর উপরই সন্তুষ্ট থাকতে পারবে, অটল অবিচল থাকতে পারবে, তাদের জন্য রয়েছে মহা কল্যাণের সুসংবাদ। ইরশাদ হয়েছে,
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١)
نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢)

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা বলে, 'আল্লাহই আমাদের একমাত্র রব' অত:পর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে নাযিল হয় (এবং বলে,) 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল'। 'আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবী করবে। পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ।" (সূরা ফুসসিলাত ৪১, আয়াত ৩০-৩২)

২. মা দীনুকা- তোমার জীবন-ব্যবস্থা কি?

কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মা দীনুকা। অর্থাৎ তোমার দীন কি ছিল? পবিত্র কুরআনে চারটি অর্থে দীনকে বোঝানো হয়েছে। ১.ধর্ম, ২.কর্মফল, ৩.জীবন ব্যবস্থা, ও ৪.রাষ্ট্রীয় সংবিধান।

এখানে দীন বলতে জীবন-ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। জীবন-ব্যবস্থার মধ্যে ধর্ম, কর্মফল, রাষ্ট্রীয় সংবিধান সকল কিছুই অন্তর্ভূক্ত থাকে। এ প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হবে দুনিয়াতে মৃত ব্যক্তি কোন জীবন-ব্যবস্থা দ্বারা তার জীবন পরিচালনা করেছেন। রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে কোন সংবিধানকে মান্য করেছেন।

এখন দুনিয়াতে আমাদের জীবন-ব্যবস্থার দিকে তাকানো যাক। বর্তমান সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে-

১. ইসলাম।
২. পুঁজিবাদী বা গণতন্ত্র।
৩. সমাজতন্ত্র বা কমনিউজম।

এবারে এ জীবন-ব্যবস্থাগুলোর সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম - একটি জীবন-ব্যবস্থা :

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাণী জগত বা বস্তু জগতের সকল কিছুকেই বস্তু (matter) হিসেবে তুলনা করা হয়। দেশের সকল সম্পদ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কোন সম্পদের মালিক হতে পারেন না। সকলে রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করবে এবং রাষ্ট্র তাদের জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী

ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। নাগরিকদের জীবন যাপনের সকল নিয়ম-কানুন এ ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এটি একটি জীবন-ব্যবস্থা।

এ ব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে তারা ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে না। তাদের মতে সৃষ্টিকর্তার কোন অস্থিত্ব নেই। ফলে দুনিয়ার কোন কিছুই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেন নাই। তাহলে কথা দাড়াচ্ছে, কোন জিনিস সৃষ্টি করা হয় নাই, তাই কোন জিনিসের শুরুও নাই। যার শুরু নাই তার শেষও নাই। এ সকল বস্তুবাদী অবাস্তব কমিউনিজম ব্যবস্থা নব্বই দশকের প্রথম দিকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং কমিউনিজমের ধারক সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কমিউনিজম আজ পৃথিবীতে মৃতপ্রায়। এ ব্যবস্থা পৃথিবীতে ফিরে আসার সম্ভাবনাও কম, তাই এ নিয়ে আলোচনার তেমন প্রয়োজন পরে না। তবে যারা কমিউনিজম অনুযায়ী জীবন যাপন করছে বা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে, স্পষ্টতঃই তারা কমিউনজমকে জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই তারা 'মা দীনুকা' প্রশ্নের জবাবে বলতে বাধ্য হবে 'আমার দীন হচ্ছে কমিউনিজম'।

পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্র- একটি জীবন ব্যবস্থা :

পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্র একটি জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার কয়েকটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে-

১. স্বার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হচ্ছে জনগণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করবে।

২. আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা জনগণের।

৩. জনগণ যেকোন সম্পদের মালিক হতে পারে।

৪. ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং তা জীবনের কাজকর্ম থেকে আলাদা।

এ বিষয়গুলোগুলো আপাততঃ দৃষ্টিতে খুব মুখরোচক মনে হলেও এর বাস্ত বতা বেশ উল্টো। এ বিষয়গুলোর উপর সামান্য আলোকপাত করা যাক। এ ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণ স্বার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে। অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় বা হালাল-হারাম নিজেরা নির্ধারণ করে নিতে পারে। যেমন আমাদের পার্লামেন্টের সদস্যগণ যদি সূদ, মদ কিংবা পতিতাবৃত্তি বৈধ বলে আইন পাশ করে, তাহলে তা জনগণের জন্য আইনত: বৈধ বা হালাল হয়ে যাবে, যদিও তা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী নিষিদ্ধ। ইসলাম,

কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত যেকোন আইনকেই অবৈধ ঘোষণা করে। তাই দুনিয়ার সকল মানুষ এক হয়ে মতামত প্রদান করলেও একটি হারামকে হালাল কিংবা একটি হালালকে হারামে রুপান্তর করার অধিকার রাখে না। এ বিষয়গুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। মানুষেরা এ আইন পরিবর্তন করলে তা হবে আল্লাহ তা'আলার সাথে বিদ্রোহ করার শামিল। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষেরা হালাল-হারাম নিজেরা নির্ধারণ করে। মানুষরা যখন আইন প্রণয়ন করে, তখন তারা জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য উল্টা-পাল্টা আইন প্রণয়ন করতে পারে। আমাদের দেশে ছেলে ও মেয়েতে বিয়ে হয়, কিন্তু ইউরোপ এ ব্যবস্থায় আর মজা পায় না। তাদের মজা এখন পুরুষে পুরুষে বিয়ে করায়। তারা এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা আইন পাশ করে নিয়েছে যে, তারা পুরুষে-পুরুষে বিয়ে করতে পারবে। এখন এটা তাদের জন্য বৈধ বা হালাল। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় আইন প্রণেতারা এমনিভাবে যখন যেমন ইচ্ছে আইন বানাতে পারে, যেমন ইচ্ছে কোন বিষয়কে বৈধ বা অবৈধ বানাতে পারে। ইরাকে যে মার্কিনীরা অন্যায় যুদ্ধ এবং ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে তাও সে দেশের সিনেটরগণ গণতান্ত্রিক পন্থায় আইন পাশ করে বৈধ করে নিয়েছে।

এ হচ্ছে গণতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নগ্ন চেহারার দু' একটি খন্ডিত চিত্র মাত্র। ইসলাম মানুষদের এ ধরণের আবাধ স্বেচ্ছাচারীতার সুযোগ দেয় না। মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা যেমন- ভবিষ্যতের জ্ঞান, নিরপেক্ষতা, ভাল মন্দ বুঝার শক্তি, গোপন বিষয় নিরীক্ষণ করা ইত্যাদি সীমাবদ্ধতার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আইন প্রনয়ন করার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন নাই। বরং তার প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়ন করা এবং সমাজে প্রচলন করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর একটি দিক হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানার স্বাধীনতা। অর্থাৎ যে কোন মানুষ যে কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারে। ফলে সম্পদ উপার্জনের বিভিন্ন অনৈতিক পন্থার উদ্ভব হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন জাতিকে উপনিবেশে পরিণত করার মাধ্যমে সম্পদ লুন্ঠন করে চলেছে। ইসলামে কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হতে পারে না, কারণ তা হচ্ছে জনগণের সম্পদ। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এসকল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানার অধিকারের ফলে চরম মুনাফা লিপ্সা, শোষণ এবং জনগণের ভোগান্তির অসংখ্য বাস্তব চিত্র আমারা প্রত্যক্ষ করে থাকি।

কিন্তু ইসলাম শরিয়াহ স্বীকৃত পন্থা ব্যতীত সম্পদ উপার্জন করাকে বৈধ করে নি। যেমন সম্পদ লুণ্ঠন করা, সুদ, একচেটিয়া মজুতদারী, নিষিদ্ধ পণ্য ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন বা এ জাতীয় পন্থা অবলম্বন করে সম্পদ উপার্জন করা যাবে না।

এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে "ধর্ম থেকে জীবনকে আলাদা করে দেয়া"। মানুষরা কেবলমাত্র মসজিদ, মন্দির বা গির্জার মধ্যে যার যার ধর্ম পালন করবে এবং সমাজ জীবন বা রাষ্ট্রের অন্য সকল কাজ-কর্মে ধর্ম কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। সেক্যুলারিজমের নামে এ প্রচারণা আজ সারা বিশ্বকে হজম করানো হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা করার নামে ধর্মের অস্তিত্বকে মসজিদ-মন্দিরের মধ্যে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে কিন্তু জীবনের কাজে-কর্মে তা অকার্যকর করে দেয়া হয়েছে। যখন ধর্মকে স্বীকার করে নেয়া হল তখন সৃষ্টিকর্তা এবং তার সকল সৃষ্টিকেও অবিচ্ছেদ্যভাবে মেনে নিতে হবে। যখন সৃষ্টিকর্তা ও তার সকল সৃষ্টিকে মেনে নেয়া হল, তখন এ সৃষ্টিকর্তার সাথে জীবনের সকল কাজ কর্মের কোন সম্পর্ক থাকবে না এটা কি করে হতে পারে? এটা একটা অনুর্বর মস্তিস্কের স্থুল চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়।

মূলতঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এ সকল বিষয়গুলো ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সংবিধান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা সর্বস্তরেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দ্বারা জীবন চালাচ্ছি। এ ব্যবস্থার দ্বারা জীবন পরিচালনা করা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য বৈধ করেন নি। তিনি বলেছেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থঃ "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থের শামিল" (আল ইমরান, ৩ ঃ আয়াত ৮৫)
অথচ আমরা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছি পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্র। আজকের সমাজের মুসলমানরা অনেকে ইসলামকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র বাস্ত বায়ন করার জন্য কাজ করে, অনেকে গণতন্ত্র বলে গলা শুঁকিয়ে ফেলেন। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣)

অর্থ: "তারা কি আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে।" (সূরা আলে ইমরান ৩, আয়াত ৮৩)

জবাবাদিহিতার কিছু সুন্দর সুন্দর কথা বলে আজ মুসলমানদের গণতন্ত্র হজম করানো হচ্ছে, কিন্তু ইসলামে তার চেয়েও আরো বেশী জবাবদিহিতার উদাহরণ রয়েছে। হযরত ওমরের (রা.) জুমার নামাজে খুৎবা দেয়ার সময় একজন সাধারণ মুসল্লীর কাছে তাঁকে সরাসরি জবাবদিহি করতে হয়েছিল। সে ঘটনা আমরা সকলে জানি। তখন একজন রাষ্ট্র প্রধান একজন সাধারণ মানুষের কাছে জবাদিহি করতে প্রস্তুত ছিল কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়ে। আজকে একজন রাষ্ট্র প্রধান, একজন সাধারণ মানুষের কাছে কতটুকু জবাবদিহি করতে প্রস্তুত? আজকের মুসলমানরা সে সকল বিষয় বেমালুম ভুলে গিয়ে গণতন্ত্রের জয়গান গেয়ে বেড়াচ্ছে।

একজন মুসলমানের জীবনের সকল আইন-কানুন অনুসৃত হবে পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে। একজন মুসলমান কখনোই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থা বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা জীবন পরিচালনা করতে পারবেন না। আজকের সমাজের মানুষেরা 'পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্রিক' ব্যবস্থা দ্বারা জীবন চালাচ্ছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছেন। এ মুসলমানদেরকে কবরে ফিরিশতারা যখন জিজ্ঞেস করবেন "মা দ্বীনুকা?" তার জবাবে তারা বলতে বাধ্য হবে যে 'আমার দ্বীন ছিল পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্র'। তাহলে এ ধরণের জবাব দিয়ে কি কবরের কঠিন আযাব থেকে পরিত্রান পাওয়া যাবে? তাহলে আমরা কোন ভরসায় ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ না করে কিংবা ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থেকে অন্য ব্যবস্থা দ্বারা জীবন চালাচ্ছি?

ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা ঃ

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি জীবন-ব্যবস্থা। তিনি নিশ্চয়ই মানুষদের তৈরি করে পৃথিবীতে তাদের নিজেদের খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দেননি। মানুষরা পৃথিবীতে কিভাবে জীবন পরিচালনা

করবে অর্থাৎ কিভাবে তারা অর্থনীতি পরিচালনা করবে, সম্পত্তির বন্টন কিভাবে হবে, সমাজ ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব কি হবে, একজন মানুষ কোন কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারবে, বিচারকার্য কোন আইন দ্বারা করবে, রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে, পররাষ্ট্র নীতি কি হবে এর যাবতীয় আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, পবিত্র কুরআনে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য কুরআনকে বলা হয়েছে' "পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান"। আল্লাহ তা'আলা এ জীবন-বিধান মুসলমানদের জন্য মনোনীত করেছেন। তিনি বলেছেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীম দ্বীন হলো ইসলাম।' (আল ইমরান, ৩ ঃ আয়াত ১৯)

মুসলিমরা যেনো ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন বা জীবন ব্যবস্থায় ফাঁদে বিভক্ত না হয় সেজন্য অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.

অর্থ: "তোমরা মুশরিকদের মত হয়ো না, যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং তারা দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে খুশী।" (সূরা রূম, আয়াত ৩১-৩২)
তাহলে মুসলমানরা কি আল্লাহর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে অন্য জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের অধিকার রাখে?
ইসলাম এসেছে জীবনের সকল কর্মকান্ডের সমাধানসহ পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে। সেজন্য মুসলমানদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে ইসলাম বাস্তবায়িত থাকতে হবে এবং সকল হুকুম আহকামগুলো জীবনে প্রয়োগ ঘটাতে হবে। শরীয়াহকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শরীয়াহ ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোন কিছুর অনুসরণ করা যাবে না। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।" (সূরা বাকারা ২, আয়াত ২০৮)
অন্যত্র আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআ'মত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম ইসলামকে।"(সুরা মায়িদা ৫, আয়াত ৩)
এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যেটাকে আল্লাহ সুব. মানুষের জন্য নিয়ামত স্বরূপ নাজীল করেছেন।

কবরে দীন সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে হলে দুনিয়াতে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও একমাত্র দীন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আংশিক হলে হবে না। কেননা মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

অর্থ: "তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।" (সুরা বাক্বারা ২, আয়াত ৮৫)

এজন্যই কোন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলামকে মানে কিন্তু রাজনৈতিক ময়দানে ধর্মনিরপেক্ষ হয় বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী বা পুঁজিবাদী হয় তাহলে সে ইসলামকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি। বরং সে কুরআনের পরিভাষায় 'মুজাবজাব' বা 'দোদুল্যমান ব্যক্তি' বলে গণ্য হবে। যেটা মুমিনদের স্বভাব নয় বরং মুনাফিকদের চরিত্র। ইরশাদ হচ্ছে:

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

অর্থ: "তারা এই (দ্বীনের) ব্যাপারে দোদুল্যমান, না এদের (মুমিনদের) দিকে আর না ওদের (কাফেরদের) দিকে। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন তুমি কখনো তার জন্য কোন পথ পাবে না।" (সুরা নিসা ৪, আয়াত ১৪৩)

এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:) আরও বলেছেন:

يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا.

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

অর্থ: "তারা বলে 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব।" (সুরা নিসা ৪, আয়াত ১৫০-১৫১)

ইসলামী ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে জীবনে গ্রহণ করতে পারলে কিংবা তা বাস্তবায়নের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকলেই হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে "মা দীনুকা" প্রশ্নের উত্তর সহজ করে দিবেন।

৩. ওয়া মান হাযার রাজুল

কবরে তৃতীয় প্রশ্ন হবে "ওয়া মান হাযার রাজুল"। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে "ইনি কে?" অর্থাৎ তোমার নবী কে বা তুমি কার আদর্শ গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করেছ? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

অর্থঃ "আর তোমাদের জন্যে রাসূলের মাঝে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, যে মহান আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে" (সূরা আহযাব ৩৩, আয়াত ২১)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তা পুরাপুরিভাবে আমাদের জীবনে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।

ইসলামকে জীবনে প্রয়োগ করতে হলে মুসলমানদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পরিপূর্ণ অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক এবং সেখানে নতুন কিছু যোগ বা বিয়োগ করা যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থ: "রাসূল সা. তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা বাতিল করেছেন তা পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (সূরা হাশর, আয়াত ৭)

এক্ষেত্রে অন্য কোন পন্থার অনুসরণ বা সংযোজন করা যাবে না। আমাদেরকে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পথ প্রদর্শনের দিশারী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে মান্য করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মান্য করার অর্থ হচ্ছে তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তা পালন করা এবং বাস্তবায়ন করা। তাহলেই কবরের "ওয়া মান হাযার রাজুল" প্রশ্নের জবাবে বলা যাবে যে, ' ইনি হচ্ছেন আমার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'।
কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্য করার কথা বলেন। কিন্তু তিনি যে ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তা বাদ দিয়ে অন্য ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেন। কিংবা প্রশান্তির সাথে অন্য ব্যবস্থার দ্বারা জীবন পরিচালনা করেন। যেমন যারা কমিউনিজম বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে, তারা আসলে মার্কস বা লেলিনকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। যারা পুঁজিবাদী বা গণতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে, তারা আব্রাহাম লিংকনকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সমাজের মধ্যে আরো অনেক মানুষ আছে যারা এভাবে বিভিন্ন মতাদর্শের ধারকদেরকে জীবনের আদর্শ-পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যারা যে আদর্শকে গ্রহণ করেছেন তাদের নবী হিসেবে সে আদর্শের ধারককেই বুঝায়। তাই তারা বলবে আমার আদর্শ বা নবী ছিল- মার্কস, লেনিন বা আব্রাহাম লিংকন এদের কেউ। তাহলে তারা কি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাফায়াত অর্জন করতে পারবে?
যারা কেবলমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করছেন, "ওয়া মান হাযার রাজুল" প্রশ্নের জবাবে কেবল তারাই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের নবী হিসেবে দাবী করতে পারবেন।

দীন কায়েমের চেষ্টা :

রাসূলুল্লাহ সা. এ জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পদ্ধতি (method) দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি সা. পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আর্ন্তজাতিক সকল ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে গেছেন এবং উম্মাহকে তা পালন করার পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি যেভাবে দীন কায়েম করেছেন সে পদ্ধতি অনুসরণ করে দীন কায়েম করতে হবে।

প্রত্যেকটি জীবন আদর্শের মধ্যে দুটি অংশ থাকে একটি হচ্ছে ফিকরা এবং অন্যটি হচ্ছে তরিকাহ। তরিকাহ দ্বারা ফিকরা বাস্তবায়ন করা হয়। ইসলামের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন হচ্ছে ফিকরাহ এবং রাসুল সা.-এর জীবন বা সুন্নাহ হচ্ছে তরিকা। এ তরিকাহ অনুযায়ী কুরআনের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে।

তেমনি পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থারও দুটি অংশ রয়েছে। পূজিবাদী জীবন ব্যবস্থার ফিকরাহ হচ্ছে- পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ এবং এর তরিকাহ হচ্ছে গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক তরিকাহ অনুযায়ী পুঁজিবাদ কায়েম করা হয়।

পুঁজিবাদী কুফর ব্যবস্থার মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে জীবন যাপনে অভ্যস্ত মুসলিম উম্মাহ আজ দীন কায়েম করতে গিয়ে তার নিজস্ব তরিকাহ বাদ দিয়ে কুফর তরিকায় অভ্যস্ত হয়ে পরছে। অধিকাংশ ইসলামী দল গণতন্ত্র নামক কুফর তরিকাহ দ্বারা আল্লাহর দীন কায়েম করতে কাজ করছে। গণতন্ত্র দ্বারা ইসলাম কায়েমের চেষ্টা আর যাই হোক এটি ইবাদত হতে পারে না। দীন কায়েমের ক্ষেত্রে রাসুল সা.-এর পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে। অনেকে নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিকে রসুল সা.-এর পদ্ধতি হিসেবে চালিয়ে দিতে চান। রাসুল সা. কখনো বৈরাগ্যবাদ বা পীর ফকিরী বা মাজার কবর ব্যবস্থার দ্বারা দীন কায়েম করেন নাই। এমনকি তিনি দীন কায়েম করতে কোন রকম সহিংস পন্থাও অবলম্বন করেন নাই। কিংবা তিনি কেবল মাত্র ব্যাক্তি পরিবর্তন করে বসে থাকেন নাই এবং বলেন নাই যে ব্যাক্তি পরিবর্তন হতে হতে দীন কায়েম হয়ে যাবে। কিংবা তিনি প্রচলিত কোন ব্যবস্থা মেনে নিয়ে কুফর ব্যবস্থার সাথে আতাত করে দীন কায়েমের কাজ করেন নাই, তিনি মক্কার দারুল নদওয়ার সদস্য হন নাই কিংবা মক্কার জাহিল সমাজের কোন আপোষ প্রস্তাবও মেনে নেন নাই। আজকে আনেকে দীন কায়েম করতে গিয়ে নিজেদের মনগড়া সুবিধা

অনুযায়ী পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করছেন এবং রাসুল সা.-এর পদ্ধতি অনুযায়ী চালিয়ে দিচ্ছেন। এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
রাসুল সা. দীন কায়েম করতে গিয়ে ব্যাক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত দিয়েছেন, দলবদ্ধ ভাবে সাহাবাদের নিয়ে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন, মক্কার কুফর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, মক্কার সমাজ নীতি, অর্থনীতি, ইবাদত করার পদ্ধতি নিয়ে কথা বলেছেন, কুফর ব্যবস্থার মোকাবেলা করেছেন, বিনিময়ে অত্যাচারিত, নির্যাতীত হয়েছেন, কখনো কুফর ব্যবস্থার সাথে মাথানত করেন নাই কিংবা তাদের সাথে কোন আতাত ও আপোষ রফা করে ক্ষমতার ভাগাভাগি করেন নাই, ইসলামী ভূখন্ড প্রষ্ঠির জন্য শক্তিশালী গোত্র প্রধানদের আহ্বান করেছেন তাদের সাথে আলোচনা করেছেন। পরিশেষে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে আউস এবং খাজরাজ গোত্রের সহায়তায় মদিনাতে খিলাফত রাষ্ট্রে দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীন কায়েম করার সঠিক পদ্ধতি ব্যাখা করতে হলে তা দীর্ঘ আলোচনার দাবী রাখে। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা দীঘায়িত করলাম না। পরিশেষে বলা যায় যারা সুন্নাহ বাদ দিয়ে গণতন্ত্র দ্বারা দীন কায়েমের কাজ করছেন তারা মূলতঃ রাসুল সা.-এর পদ্ধতি অমান্য করছেন।

আসুন আমরা কবরের উত্তরের জন্য প্রস্তুত হই

তাহলে এ আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রব হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করলে, জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামি ব্যতীত অন্য কোন মানব রচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এবং নেতা হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ব্যতীত অন্য কারো আদর্শ বাস্তবায়ন করলে, কবরের সওয়াল জবাবের সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব হবে না। অর্থাৎ দুনিয়াতে জীবনকে যে যেভাবে পরিচালনা করেছেন সেভাবেই বের হয়ে আসবে তার উত্তর। এ যদি আমাদের অবস্থা হয়, তাহলে কবরের কঠিন বাস্তবতায় কিভাবে পরিত্রান পাওয়ার আশা করা যেতে পারে? এ উত্তর সঠিক না হলে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত ভয়াবহ কঠিন আজাব।
আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপ্রাণ হলেও তারা সমাজের অনৈসলামিক আচার-আচরণ নিয়ম কানুনের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, বিচার-ফায়সালার সকল ক্ষেত্রে অনৈসলামিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আমাদের

উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অনৈসলামিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে জীবনে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইসলামকে গভীরভাবে বুঝতে হবে, ইসলাম কেবলমাত্র নামায রোজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামকে বুঝতে হবে জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে এবং এ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে হবে। ইসলাম বাস্তবায়িত হলেই মুসলমানরা তা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন।

একটু ভেবে দেখুন, কমিউনিজম একটি ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ছাড়া তা বাস্তবায়ন করা যায় না। গণতন্ত্র একটি ব্যবস্থা, তাও বাস্তবায়ন করার জন্য রাষ্ট্রের দরকার হয়। ইসলাম একটি ব্যবস্থা তাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে কায়েম করে দেখিয়ে গেছেন। রাষ্ট্র যখন ইসলামকে বাস্তবায়ন করবে, আপনি কেবলমাত্র তখনি ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পালন করতে পারবেন। রাষ্ট্র বাস্তবায়ন না করলে আপনি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার কবরের প্রশ্নের উত্তর, আপনার রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এভাবে কবরের প্রতিটি জবাব আপনার রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত। তাই কবরের সঠিক জবাব দেয়ার জন্য আপনার রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব আপনাকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা ইসলাম বাস্তবায়ন করেছিলেন। এ ব্যবস্থা ১৩০০ বছর পর্যন্ত মুসলমানদের জীবনে ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করে রেখেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামকে বাস্তবায়ন করে আমাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলেই রব হিসেবে কোন অনৈসলামি শক্তির কাছে মাথা নত করার প্রয়োজন হবে না, জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে না এবং নবী হিসেবেও কোন বাতিল মতবাদের ধারকদের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে না। তাহলেই কবরে প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়া সম্ভব হবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম বাস্তবায়ন করার কথা বললেই আজকাল পশ্চিমা মদদপুষ্ট এক শ্রেণীর মিডিয়া আপনাকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী বানিয়ে ছাড়বে। কারণ পশ্চিমারা মুসলমানদের পুণঃজাগরণকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। তাই ওরা মুসলমানদের ঈমান-আকীদা থেকে দুরে সরিয়ে রাখার চেষ্টায় ব্যপ্ত। আমাদেরকে এ দূরাবস্থা

থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুঁজিবাদের মুখোশ খুলে দিয়ে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

সেই সাথে ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সোচ্চার হতে হবে, যে ব্যবস্থা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে, রাষ্ট্রের সকল পত্র-পত্রিকা মিডিয়া মানুষদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে, সকল অনৈসলামিক নিয়ম-কানুন পরিহার করবে, পরকালের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করবে। তাহলে মানুষেরা আর পরকালের বাস্তবতা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকবে না। এভাবে একটি পরিশুদ্ধ সমাজ তৈরি হবে যা মানুষদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধনে সহায়ক হবে। আসুন আমরা মৃত্যুর আগে এ বাস্তবতা অনুধাবন করি এবং কবর আযাব ও পরকালে মুক্তির জন্য ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করি।

একবার একটু চোখ বন্ধ করুন। ভাবুন, আপনি আজিমপুর কিংবা মিরপুরের কোন গোরস্থানের মাটির নিচে। এখন সবকিছু চলছে ঠিকঠাক। রাস্তায় গাড়ি চলছে। গুলিস্থানের হকাররা বেচাকেনা করছে। আপনার আমার অত্মীয়-স্বজন যে যার কাজে ব্যস্ত। আর কবরের মাঝে মস্ত বড় আযাবের ফেরেস্তা যদি পাকড়াও করতে থাকে তাহলে অবস্থা কতটা বিভিষিকাময়। আসুন আমরা এরকম অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য সাবধান হই এবং কবরের বাস্তবতা অনুধাবন করে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি-

- সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ত্রানকর্তা, রিজিকদাতা, আইনদাতা রব হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে গ্রহণ করতে হবে।
- দীন হিসেবে সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্র বর্জন করে একমাত্র ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ইসলামকে দীন হিসেবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে পরে। আমদেরকে সে ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পালন করতে হবে।
- আদর্শ বা নবী হিসেবে মার্কস, লেলিন বা আব্রাহাম লিংকন এদের বাতিল Ideolog বা দর্শন পরিত্যাগ করে একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দর্শন বা আদর্শ নিয়ে এসেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে হবে। তাহলেই তাকে নবী হিসেবে মান্য করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসকল বিষয়ে সঠিক অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন। আমীন!